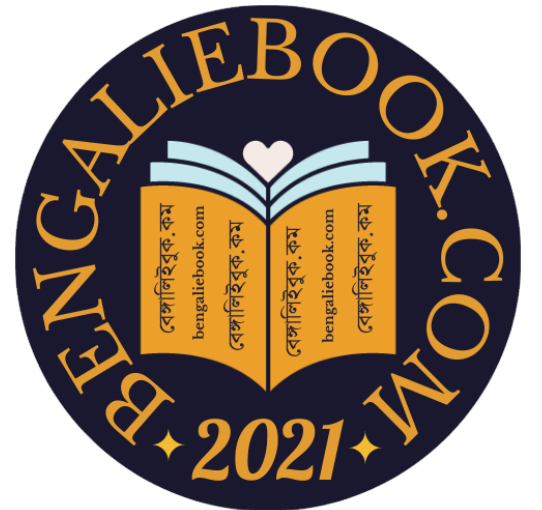


গল্প

ব্রাহ্মণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



রোমান্স

কলসি কাঁখে পাতলা ছিপছিপে একটি বৌ বেগুনক্ষেতের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কলসির ভারে একটু সে বাঁকা হয়ে পড়েছে। পিতলের প্রকাণ্ড কলসি, মাজা ঘষা চকচকে। বৌটির পরনের কাপড়খানি ভেজা, এখানে ওখানে গায়ে ঐটে গেছে, লটপট করছে। গড়ন পাতলা হলেও স্বাস্থ্য তার খুব ভালো। গায়ে রীতিমতো জোর না থাকলে অতবড় কলসির ভারে কোমর তার মচকে যেতে পারত।

সূর্য এখন প্রায় মাথার উপর। রোদের তাপে পায়েচলা সরু পথটির পাশে ঘাসে-ঢাকা মাটি পর্যন্ত তেতে গেছে। ভিজে গামছা ভাঁজ করে বৌটি মাথায় বসিয়েছে।

বেগুনক্ষেতের পরে ছোটখাটো আম-কাঁঠালের বাগান। গাছে গাছে বাগানটি জমজমাট। কিন্তু কেমন যেন শুকনো নিষ্ফল চেহারা গাছগুলোর, কয়েকটি গাছে শুধু কাঁচাপাকা দু-চারটি আম ঝুলছে। বাগানের ওপাশে টিনের চাল আর দরমার বেড়ার বাড়ি আছে টের পাওয়া যায়, গাছের ফাঁকে ভালো করে চোখ পড়ে না। বাকি তিনদিকে দূর বিস্তৃত মাঠ আর ক্ষেত, এখানে-ওখানে বাড়িঘর গাছপালার ছোট ছোট চাপড়া বসানো। বেগুনক্ষেতের চারদিক নির্জন, দিনে-রাতে সবসময় কারো কারো এখানে কমবেশি গা ছমছম করে।

বেগুনক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পুরনো প্যাঙাসে আলপাকার উর্দি আর কোলবালিশের সরু খোলসের মতো প্যান্টালুন-পরা মাঝবয়সী একটি লোক জোরে জোরে আম-কাঁঠালের বাগানটির দিকে চলছিল। বারবার সে বৌটির দিকে চেয়ে দেখছে। গোঁফদাড়ি চাছা এবং কানের ডগা পর্যন্ত জুলপি তোলা তার লম্বা ফরসাটে মুখ চোখ দুটি বেশ বড় বড়, যদিও ছোট হলেই মানাত বেশি।

বাগানের একটা কাঁঠালগাছের নিচে সে বৌটির পথ আটকাল। পাশ কাটিয়ে যাবার পথ অবশ্য চারদিকে অনেক ছিল। পায়েচলা যে সরুপথটি ধরে বৌটি আসছিল সেটাও

কাঁঠালগাছটির হাত তিনেক তফাত দিয়েই গিয়েছে। বৌটি নিজেই সরে তার সামনে আসায় এগোবার আর পথ রইল না।

ওমা, সুবলবাবু যে! পেন্নাম।

এ তোমার কেমন ব্যাভার সুখময়ী?

তোমারই বা এ কেমন ব্যাভার সুবলবাবু, দিনদুপুরে নাগাল ধরা?

দুহাতে কানা ধরে কলসিটা যে নামিয়ে রাখল। সে কাঁখে কলসি ছিল তার উল্টো দিকে বঁকে বঁকে সোজা করে নিল কোমরটা। সুবলের ত্রুদ্র নালিশভরা দৃষ্টি দেখে একবার সে অপরাধিনীর মতো একটু হাসল। অবহেলার সঙ্গে কাঁধে ফেলা ভিজে আঁচলটি নামিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আবার ভালো করে গায়ে জড়াল।

গোড়ায় তো ডরিয়ে লোম, কোন মুখপোড়া উঁকি মারছে গো? শেষে দেখি মোদের সুবলবাবু। নিশ্চিন্দি হয়ে তখন সাঁতার কেটে চান করলাম। ফিক করে হেসে লজ্জায় মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তোমার জন্যে। সত্যি তোমার জন্যে কাল ফিরে যেতে হল তোমার!

সুবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, কাল তো প্রথম নয়। ফিরেই তো যাচ্ছি। এলে না কেন কাল? রাতদুপুর তক শিরীষতলায় মশার কামড় খেলাম। মা মনসা না করুন, দুহাত জড়ো হয়ে সুবলের কপালে ঠেকে গেল সাপের কামড়ে মরব একদিন।

সুখময়ী আফসোসের আওয়াজ করল চুকচুক, বালাই ষাট। কিন্তু কী করি, তেনা যে ফিরে এল গো!

একবার জানান দিয়া তো যেতে পারতে, সবাই ঘুমুলে পর? ঘুরঘুটি আঁধারে একটা মানুষ হাঁ করে-

ঘুমিয়ে পড়লাম যে! ওনার সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঝগড়া হল? বেশ, বেশ! তা ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?

সোয়ামির সাথে মেয়েমানুষের আবার কী নিয়ে ঝগড়া হয়? শাড়ি গয়না নিয়ে।

সুবল হঠাৎ উত্তেজিত, উৎসুক হয়ে বলল, তুমি যত শাড়ি গয়না চাও—

ইস? ফতুর হয়ে যাবেন! ছায়ায় চাপা আলো লেগে সুখময়ীর পান-খাওয়া দাঁতের ঘষামাজা অংশগুলোতে ভোতা ঝকমকি খেলে গেল।—

ফতুর নয় হলে। মোর তরে ফতুর হইতে তো চাইছ তুমি হাজারবার। কিন্তু শাড়ি সোয়ামি যখন শুধোবে মোকে, অ বৌ, শাড়ি গয়না কোথায় পেলি লো, কী জবাব দেব শুনি? বলব নাকি, কুড়িয়ে পেইছি গো, ঘাটের পথে কুড়িয়ে পেইছি? তার চেয়ে এক কাজ করো না? শিরীষতলায় মশার কামড় খেয়ে তোমারও কাজ নেই, শাড়ি গয়না পরে বেড়ালে কেউ যে শুধোবে তাতেও মোর কাজ নেই—এমনি কিছু করো?

সুবলের মুখখানা লম্বাটে হয়ে গেল।—তা জানি, তোর শুধু গয়না শাড়িতে মন।

না গো না, গয়না শাড়ি আমি চাইনে। আমার মনটি তোমার।

তাই যদি হত সুখী—

হত মানে? তুমি ভাবো গয়নার লোভে তোমায় মন দিইছি। কত গয়না দেবে তুমি? কত মুরোদ তোমার? কলকাতায় নিয়ে সেজবাবু সোণায় মুড়ে রানী সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তা গিইছি আমি? আমি বলি—না, যাকে মন দিইছি তার সাথেই চুলোয় যাব, চুলোয় যদি যাই।

হা।

বিশ্বেস হয় না, না? বেশ তো, চলো না এখুনি যাই। এক কাপড়ে এখুনি গিয়ে গাড়ি ধরি তিনটের। তুমিও ফকির, আমিও ফকির।

পাতার ফাঁক দিয়ে সুবলের সর্বাঙ্গে চাকাঁচাকা আলো আঁকা হয়ে গেছে। ভিজে গামছা দিয়ে সুখময়ী তার মুখ আর ঘাড়ের ঘাম সযত্নে মুছে দিল। কিন্তু সুবল খুশি হয়েছে মনে হল না, সুখময়ীর কাছ থেকে এ রকম ছোটখাট আদর পাওয়ার বিশেষ দাম যেন নেই, পুরোনো হয়ে গেছে।

অমন যার মন হয় সে একবারটি শিরীষতলায় আসে। কাল নিয়ে চারবার ঠকালে আমায়।

ওগো মাগো, ঠকালাম! আমি তোমায় ঠকালাম! ভেস্টে গেল তো কী করব আমি? হাতপা বাধা মেয়েলোক বৈ তো নই। ঘরের বৌ, পরের দাসী, কী খ্যামতা মোর আছে বলো, তোমায় ঠকাব, তোমার জন্য মরণ হয়েছে আমার? কিছু ভালো লাগে না সুবলবাবু, একদণ্ড ঘরে মনে বসে না। মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি। মন করে কী, দূর ছাই, ঘর-সংসার ফেলে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই।

বড় একটা ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ সুখময়ীর মুখ ঘেসে কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে পড়েছে। আবেগ আর উত্তেজনায় এতক্ষণে যেন চোখ দুটি তার সেই আলোতে জ্বলজ্বল করে উঠল। সুবল কথাটি বলে না। উশখুশ করে আর এক পা থেকে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

দেশ গা ছেড়ে দূর দেশে পালিয়ে যাই, দেশে কেউ মোদের চিনবে না। সব বালাই চুকিয়ে দুজনে ঘরকন্না করি।

তা হয় না সুখময়ী। চাদিকে বড় নিন্দে হবে, আর ফেরা যাবে না।

কে ফিরছে হেথা? জমি-জায়গা সব বেচে দিয়ে আমায় নিয়ে পালাবে। মোদের ফিরবার দরকার!

মোক্তারি করে দুটো পয়সা পাচ্ছি-

এখানে গাছের ছায়াতে গুমোটো নরম, সুবলের কপাল ঘেমে চোখে এসে পড়তে চায়। আঙুল দিয়ে সে কপালের ঘাম মুছে মুছে ঝেড়ে ফেলতে থাকে। সুখময়ীর ভিজে। চেহারা ঘাম টের পাওয়া যায় না। আগ্রহ উত্তেজনা ফুরিয়ে গিয়ে সে শান্ত হয়ে গেছে। ঝুঁকে কাপড় তুলে সে একবার হাঁটুর কাছে চুলকে নিল, সোজা হয়ে হাঁটু চুলকানো আঙুলেরই একটার ডগা কামড়ে ধরল। ঘাড় তার কাত হয়ে গেল ভাবনায়।

কলসির কানা ধরে তুলতে গিয়ে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। সুখময়ীর রাগ হয়েছে। কলসি ছেড়ে পাক দিয়ে সোজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার ফোঁস করে ফণা তুলে সাপের কামড়ে দিতে চাওয়ার মতো। কী মিষ্টি হাসিই সুখময়ী হাসল। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দ্বিধা-সঙ্কোচের ভঙ্গি করে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বুক দিয়ে সে সুবলকে গাছের সঙ্গে চেপে ধরল, মুখ উঁচু করল, সুবলের মুখের কাছে কিন্তু পৌঁছল না। গাছে পিঠ দিয়ে সুবল তখন কাঠ হয়ে গেছে।

মোর চেয়ে তোমার মোজারি বড় হল?

কত কষ্টে পসার করেছি, দুটো পয়সা পাচ্ছি-

সুখময়ী এতক্ষণে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। সুবল নরম হয়ে আসছে।

একটি হাত তার সুখময়ীর পিঠে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তুমি না ফতুর হতে পার আমার জন্যে? ঘর বাড়ি জমি জায়গা বেচে ঢের টাকা পাবে, ব্যবসা করে রাজা হয়ে যাবে তুমি! রানীর মতো খাটে শুয়ে আমি হাই তুলব, আর চাকরানী মাগীগুলোকে হুকুম করব। চানের ঘরে তুমি আমার চান দেখবে সত্যি দেখাব, দিব্যি গালছি।

আচ্ছা, তাই যাব সুখময়ী, সব বেচে দিয়ে তোমায় নিয়ে বিদেশে যাব। কিন্তু সে তো দু-চার দিনে হবে না-

মোক্তারি জান বটে তুমি সুবলবারু। দাঁড়াও আমি আসছি কলসি রেখে।

কাঁখে কলসি তুলতে গিয়ে সুখময়ী আজ বোধ হয় এই প্রথম টলে পড়ে গেল। কলসির জল শুষে নিল মাটি, আর তার ভিজে কাপড় কুড়িয়ে নিল মাটির লাল ধুলো।

অদেষ্ঠে কত আছে! বলে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভোতা গলায় সে বলল, দাঁড়াও বারু। একটু সাবুন আনি, নইলে এ মেটে রং ওঠবার নয়। ফের নাইতে হবে।

বাড়ির অঙ্গন শূন্য, ঘরের বাইরে কেউ নেই। বাইরে কেউ থাকেও না এ সময়। সুখময়ী বেঁধেবেড়ে খাইয়েছে সবাইকে, আর কোনো কাজ কারো নেই। রসুইঘরের দাওয়ায় একতাড়া মাজা বাসন। ঘাটে গিয়ে বাসন মেজে এনে তবে তার কলসি নিয়ে নাইতে যাবার ছুটি হয়। কলসি ভরে জলটি আনা চাই। পুর্বের ঘরে নটবর হুঁকো টানছে, কথা বলছে পাড়ার কানাই ধরের সঙ্গে। শাশুড়ি শুয়েছে, নটবরের বৌ-মরা ভাই তার সঙ্গে পরামর্শ করছে আগামী বিয়ের-জ্যেষ্ঠ মাসের সাতুই আসতে মাসেক সময় নেই!

বাড়ির কুকুরটা উঠে এসে লেজ নেড়ে অভ্যর্থনা জানাতেই সুখময়ী তাকে একটা লাখি কষিয়ে দিল। আর সেই অবোধ প্রাণীর কেউ কেউ আর্তনাদ শেষ হবার আগেই রসুইঘরের দাওয়ায় বাসনের গাদায় আছড়িয়ে পড়ে শুরু করল নিজের আর্তনাদ-একটু চাপা, একটু অস্বাভাবিক সুরে। ভয়ে তার গা কাঁপছিল।

সবাই ছুটে এল। একসঙ্গে শুধোতে লাগল, কী হয়েছে? বৌকে জড়িয়ে ধরে নটবরের মা জুড়ে দিল কান্না। কুকুরটা তখনো কেউ কেউ করে মরছে! সুখময়ীর বুকের মধ্যে টিপটিপ করছিল। কী থেকে কী হবে তা ভগবান জানেন, এই তার শেষ লড়াই।

সুখময়ী কেঁপে কেঁপে কেঁদে বলল, বড় ভয় পেইছি মা। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। কত বলি একলাটি ঘাটে যেতে ডর লাগে, কেউ তো যাবে না সাথে। নইলে কী ওই মুখপোড়া সুবল মোক্তার-

শুনে সবই একসাথে চুপ মেরে গেল। ইতিমধ্যে পাশের দুবাড়ির মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসেছিল। তারাও হঠাৎ চুপ হয়ে গেল জন্ম-বোবার মতো। নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি ছাড়া কী আর করার আছে এমন একটা অসম্পূর্ণ খবর শুনে? নটবরের মার কান্না থেমে গিয়েছিল, প্রথমে অধীর হয়ে শুধোল, কী করেছে সুবল মোক্তার? অ বৌ, বল না কী করেছে সুবল মোক্তার।

বাগানে একলাটি পেয়ে হাত চেপে ধরেছিল গো, কলসি ফেলে পালিয়ে এইছি। ছুটতে ছুটতে আছাড় যা খেইছি কবার-হা দ্যাখো।

হাতের তালু আর কাপড়ে রক্তমাটি ও রক্তের দাগ সে দেখিয়ে দিল। কয়েকজনের চাপা নিশ্বাস পড়ল একটু নিরাশার সঙ্গে, কতবড় সম্ভাবনার এই পরিণতি! শুধু হাত ধরেছিল! দুপুরবেলা জনহীন বাগানে মেয়েমানুষকে নাগালে পেয়ে শুধু হাত ধরেছে সুবল মোক্তার? মামলা মোকদ্দমা হবে না, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে আজকালের মধ্যে। এ কি একটা ঘটনা!

তবু সবাই ছি-ছি করে আর সুবল মোক্তারকে গাল দেয়। বাগানে গিয়ে তাকে শাসন করে আসার কথাটা কেউ ভাবেও না, বলেও না। শেষে সুখময়ীকে আঁজ দেখিয়ে বলতে হয়, অ ঠাকুরপো, দাঁড়িয়ে শুধু জটলা করবে তোমরা? যাও না, দু-ঘা দিয়ে এস না বজ্জাতটাকে?

নটবরের মা বলে, চুপ কর মাগী, চুপ কর।

কেন চুপ করব? আমার হাত ধরবে, তোমরা তা চুপ করে সয়ে যাবে!

নটবর বলল, ও শালা কি আর আছে, পালিয়ে গেছে।

থাকতে তো পারে? কলসি আনতে ফিরে যাব ভেবে থাকতে তো পারে ঘুপচি মেরে? যাও না একবার, দেখে এস!

তখন নটবর, শশধর, নিতাই আর পাড়ার একজন সুবলকে খুঁজতে যায়, নটবরের মা চৈঁচিয়ে বলে দেয়, কলসিটা আনিস কেউ। শুনছিস কলসিটা আনিস।

সুখময়ীকে ঘিরে মেয়েদের জটলা চলতে থাকে। চারদিকে তারা রটাবে, তবু তারাই বলে যে এমন হইচই করা উচিত হয়নি সুখময়ীর, জানাজানি হওয়া কি ভালো! চুপিচুপি শাউড়ি বা সোয়ামিকে বললেই পারত সে, পুকুরঘাটে যাওয়ার সময় একজন কেউ সঙ্গে যেত। সুখময়ী শুনে যায়, কথা বলে না। নটবরের মার চাপা আফসোস আর গালাগালির জবাবে শুধু ফোঁস করে ওঠে।

সুবলকে পাওয়া গেল কাঁঠালবাগানেই, কিন্তু ধরে মারবার সাহস হল না একজনেরও।

নিতাই নেহাত বদরাগী মানুষ, সে শুধু জিজ্ঞেস করল, বৌ-ঝির হাত ধরে টানা কেন মোক্তারবাবু? সুবল রেগে বলল, তোর তো বড় বড় বেড়েছে নিতাই, যা মুখে আসে তাই বলিস! শশধর মৃদুভাবে সাবধান করে দিল, আর যেন এসব না ঘটে মোক্তারবাবু।

সুবল আর কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে গেল। মুখখানা তার একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সুখময়ী ফুরিয়ে গেল, চিরতরে সরে গেল তার জীবন থেকে। একটু কলঙ্ক তার রটবে-কিন্তু তীব্র অস্বীকারের জোরে সে তা উড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু আবার যদি এমন কিছু ঘটে, দুর্নাম তার জোর পাবে।

বড় একটা মামলা ছিল সুবলের এ সময়, মনটা একেবারে খিঁচড়ে গেল! নাহ, মনটা একটু শক্ত করতে হবে তার। সবে প্র্যাকটিস জমছে। বাকি দিনটুকুতে ছোট মহকুমা শহরের চারিদিকে যে তাদের নামে টিটি পড়ে গেছে, সেটা সুখময়ী টের পেলে সন্ধ্যার পর নটবরের হাতে বাখারি খেয়ে। বাকি দিনটা বাড়ির সকলে মুখ ভার করে থেকেছে, তাকে বাদ দিয়ে করেছে জটলা। বিকেলে আড্ডা দিতে বেরিয়ে সন্ধ্যার পর মুখ অন্ধকার করে নটবর বাড়ি ফিরে এল, গর্জাতে গর্জাতে মা আর ভাইকে জানিয়ে দিল সহরসুদ্ধ লোক কী বলাবলি করেছে এবং খবরটা ভালো করে শুনবার আগ্রহে সুখময়ী কাছে এসে

দাঁড়াতে সরু একটা বাখারি তুলে তার পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। সরু বাখারির বেতের মতো ধার, পিঠ কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল সুখময়ীর।

কিন্তু সে তীব্র ব্যথা তার কাছে অতিরিক্ত ঝাল-খাওয়া সুখের মতো লাগল। কলঙ্ক তবে রটেছে! তবে আর এখন কী বাধা রইল সুবলের তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার? এ বদনাম সয়ে সে তো টিকতে পারবে না এখানে। যেতে হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না কেন?

নটবরের মা বলল, থাক, থাক। মারধর করে কাজ নেই। ও-বৌকে তো আর ঘরে রাখা যাবে না। কাল সকালে খেদিয়ে দিস। মামার বাড়ি যাক, নয়তো চুলোয় যাক।

শুনে একটু ভাবনা হল সুখময়ীর। সত্যি তাকে তাড়িয়ে দেবে নাকি? গালাগালির জন্য সে তৈরি হয়েই ছিল, তার উপর নয় কিছু মারধর হয়েছে। কিন্তু খেদিয়ে দিলে তো মুশকিল! সুবলের যদি বেশিরকম রাগ হয়ে থাকে, তাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে না চায়! পুরুষের মন তো, বিগড়ে যেতে কতক্ষণ! তবে তো তার একূল-ওকূল দুকূল যাবে, মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে না জগতে। মামা কি ঠাঁই দেবে তাকে? মামারও তো গুনতে বাকি থাকবে না এ কেলেকারির কথা।

ভাবে আর সুবলের প্রেমে বিশ্বাস হারিয়ে সে পিঠের জ্বালায় কাতরায়। চুলোর ধোঁয়ায় তার চোখ জ্বলে আর ভাতের হাড়ির বাষ্পে জগৎ ঝাঁপসা হয়ে যায়। আগুনের আঁচে মাঝে মাঝে শরীরটা শিউরে ওঠে, জ্বর আসবার মতো উদ্ভট শিহরণ। জল ছুঁতে গিয়ে গা ছমছম করে। জ্বর কি একটু এসেছে তাহলে তার? সকলকে ভাত দিয়ে হেঁসেল তুলে খাওয়ার অনিচ্ছা নিয়ে খিদের জ্বালায় কিছু খায়। রসুইঘর বন্ধ করে কুপি হাতে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ায় কুপিটা নিভিয়ে রেখে ঘরে ঢোকে। চৌকিতে বসে নটবর তামাক টানছে। কাল তাকে খেদিয়ে দেবে নটবর। এতকাল সোহাগ করে কাল তাকে দূর করে দেবে। সুবলের সঙ্গেই পালিয়ে গিয়ে-বা তার তবে কী লাভ হবে? বৌকে যদি মানুষ খেদিয়ে দিতে পারে, দুদিন পরে সুবল কেন তাকে ফেলে পালাবে না?

নটবরকে একটু নরম করার চেষ্টার কথা মনে আসে, কিন্তু সুখময়ী উৎসাহ পায়। রাগ কমিয়ে কতবার সে নটবরের সোহাগ আদায় করেছে, কৌশল তার অজানা নয়, কোনোদিন ব্যর্থও হয়নি। আজ সে মনে জোর পায় না। বাখারির মার খেয়েছে বলে নয়। মার খেলেও মান বাঁচিয়ে সোহাগ যাচা যায়। নিজের উপরেই আজ তার বিশ্বাস নেই। নিজেকে কেমন রূপহীনা, কুৎসিত মনে হচ্ছে। তার যেন কাঠির মতো সরু আর কাঠের মতো শক্ত দেহ। কী দিয়ে সে নটবরকে নরম করবে? তার চেয়ে শুয়ে পড়া ভালো। মাথা ঘুরছে, পিঠ জ্বলছে, শরীর ভেঙে পড়ছে, চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে রাতটা কাটানো যাক। সুবল নটবর সকলের ভরসাই যখন তার ফুরিয়ে গেছে, কী আর হবে আকাশপাতাল ভেবে।

চৌকিতে উঠতে তার ভরসা হল না। মেঝেতে মাদুর বিছাতে গেল। তখন কথা কইল নটবর।

দোর দে, হুকোটা রাখ।

সুখময়ী দুয়ার বন্ধ করে হুকোটা রেখে মাদুরে শুয়ে পড়ল। পিঠে ব্যথা ছিল, মনে। খেয়াল ছিল না, অভ্যাসমতো চিৎ হয়ে শুয়েই মৃদু আত্ননাদ করে সে পাশ ফিরল। চৌকিতে বসে প্রদীপের আলোতে নটবর তাকে খানিক দেখল, পা গুটিয়ে কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে বৌটা তার শুয়েছে!

পিঠ ব্যথা হয়েছে নাকি বৌ? গোসা হয়েছে? আর মারব না তোকে। কোন শালা আর তোর গায়ে হাত তোলে!

আমায় কাল তাড়িয়ে দেবে?

দূর পাগলী। ও কথার কথা বলছিলাম। তোকে ছেড়ে কি থাকতে পারি?

সুখময়ী নিজেই স্বামীকে বুকে টেনে নিয়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুজল। মাদুরের ঘষায় পিঠে যেন তার করাত চলতে লাগল অনেকগুলো। একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আবার চেতনা ফিরে এল, তবু সে শব্দ করল না। আত্ননাদগুলো বুকে চেপে, গোঙানিগুলো গলায় আটকে রেখে দিল। নটবর ছেড়ে দেওয়ামাত্র সে পাশ ফিরল। আলো নিভিয়ে চৌকির বিছানায় শোবার সময় কর্তব্যবোধে নটবর বলল, গা যেন তোর গরম দেখলাম, জ্বর হয়েছে নাকি?

একটু হয়েছে।

মেঝেতে কেন তবে? চৌকিতে আয়।

যাই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৌকিতে সে গেল না। আলো নেবার আগে সে দেখেছে, পিঠের রক্তে মাদুর লাল হয়ে গেছে।

নটবর ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঘুম গাঢ় হয়ে এলে তার নাক ডাকতে আরম্ভ করল। তখন চুপিচুপি দরজা খুলে সুখময়ী বাইরে বেরিয়ে গেল। রাত বেশি হয়নি, শশধর জেগে আছে। পাড়ার লোকও হয়তো জেগে আছে অনেকে। থাক জেগে! কতক্ষণ লাগবে তার সুবলকে দুটি কথা শুধিয়ে আসতে? বাগান হয়ে বেগুনক্ষেত পার হলেই সুবলের বাড়ি।

ডুবুডুবু চাঁদের জোছনা এখনো একটু আছে। বাগানের গাঢ় অন্ধকার কোনো রকমে পার হলে পথের চিহ্ন নজরে পড়ে। সুখময়ী তরতর করে বেগুনক্ষেতের বেড়া ঘেঁসে এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফেরা চাই, নটবরের ঘুম ভেঙে গেলে যাতে সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়তটা দেওয়া যায়। সুবলের বাড়ির ঘরে ঘরে আলো নিভেছে। তার ঘরের পাশে গাঁদাফুলের বাগান। একটু তার ফুলের বাগান করার শখ আছে। বাড়ির

সামনের বাগানটি তার দেখবার মতো, এখান থেকে নানা ফুলের মেশানো গন্ধ নাকে আসে। প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়ে সুবল বেরিয়ে এল।

চুপ। আস্তে! আবার কেন?

দ্যাখো, তোমার জন্যে কী মারটা মেরেছে আমায়।

তোমার জন্যে আমার বদনাম হল সুখময়ী। কত ভালো বলত লোকে আমায়, কত সম্মান করত, তোমার জন্যে সব গেল।

চলো আমরা পালিয়ে যাই দু-চার দিনেই মধ্যে। সব বেচে দাও-

তোমার খালি বাজে কথা। সব বেচে মোক্তারি ফেলে কোথায় যাব?

এত কেলেকারি হল, চারিদিকে টিটি পড়ে গেল, তবু থাকবে? কী করে থাকবে?

আস্তে আস্তে ভুলে যাবে লোকে।

সুখময়ী আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসছিল, সুবল তার হাত চেপে ধরল।

শিগগির ফিরতে হবে।

একটু বসে যাও? বৌ মরে গেছে কবে, এতকাল বিয়ে করিনি তোমার জন্যে। একটু বসে যাও।

সুবলের ঘাট বাঁধানো। মোক্তারির টাকায় সবে ঘাট বাঁধিয়েছে, এখনো কোথাও ফাটল পর্যন্ত ধরেনি। ঘাটের বোয়ামোছা-পরিষ্কার সিমেন্টও সুখময়ীর পিঠের রক্তে লাল হয়ে গেল। সমস্ত ঘাট নয়, সুখময়ীর পিঠের নিচেকার অংশটুকু।

পরদিন নাইতে এসে লোকে বলল, কুকুর বা বিড়াল ছানা বিইয়েছে সেখানে। কিংবা বুনো শেয়াল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । রামায়ণ । গল্প